আলোর সন্তান

আমি তখন পাটনায় হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করি। আমার ছোটকাকাকে অফিসের কাজে মাঝে মাঝে পাটনায় আসতে হত আর প্রতিবারই হস্টেলে আমার সঙ্গে দেখা করে যেতো ছোটকাকা। ভাইপো ভাইঝিদের মধ্যে আমিই ছোটকাকার সবচেয়ে প্রিয় ছিলাম, বোধহয় ভাইবোনেদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ বলেই।

মেয়েদের কলেজ, তাই আবার মিশনারী কলেজ। শুচিবাইগ্রস্ত পরিবেশ। এরই মধ্যে একটুখানি বাইরের হাওয়া বাতাস পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। ছোটকাকা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অনুমতি নিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে যেতো। সব ভিজিটরদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি ছিল না, তাদের সঙ্গে বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা। অভিভাবকেরা লিস্টে যে কজনের নাম দিতেন শুধু তারাই দেখা করতে পারতো। ছোটকাকার জন্যে বাবা একটা স্পেশাল অথরাইজেশন লেটার দিয়েছিলেন, যার দরুন আমি তার সঙ্গে দু'ঘণ্টার জন্যে বাইরে যেতে পারতাম।

হস্টেলে আমার যে ক'জন বন্ধু ছিল তার মধ্যে সান্ত্বনার সঙ্গেই সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গতা ছিল আমার। কাটিহারে বাড়ি। ছোটবেলায় বাবা মারা গেছেন, মামাবাড়িতে মানুষ। হস্টেলের খরচ মামা পাঠান। সান্ত্বনার দায়িত্ব যে মামার নিজের পারিবারিক দায়িত্বের উপর একটা বাড়তি বোঝা, সান্ত্বনা সর্বদা একথা মনে রেখে চলতো। অতি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতো সে। ভুলেও কখনো কোন শখ আহ্লাদের ছিটে ফোঁটাকে প্রশ্রয় দিতো না। ছোটকাকার সঙ্গে বাইরে গিয়ে হাট বাজারে ঘোরার সময় কিংবা রেস্টুরেন্টে খেতে বসে সান্ত্বনার কথা বার বার মনে হত। ওর জন্যেও টুকি-টাকি কিনতাম। বলা বাহুল্য আমার সব কেনাকাটাই ছোটকাকার টাকায় হত। সান্ত্বনার জন্যে স্বল্প উপহারের দামটাও ছোটকাকাই দিতো। কোন দামী জিনিস দিলে সান্ত্বনা কিছুতেই নিতো না। এমন কি খাবার জিনিস দিলেও একটুখানি নিয়ে বলতো, "আর চাই না, তুই খা।" আমি তো ভরপেট খেয়েই এসেছি রেস্টুরেন্টে বসে, কিন্তু সান্ত্বনা কিছুতেই শুনতো না। আমার মনে হত ও সব সময় নিজের চারিদিকে একটা কঠোর আত্মসংযমের দুর্ভেদ্য গণ্ডি টেনে রেখেছিল।

এরপর ছোটকাকা আগের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বায়ুসেনায় ঢুকে পড়লো। পাটনায় আসার প্রয়োজন পড়তো না আর। আমি ওই কলেজ থেকেই বি.এ. পাশ করে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. জয়েন করলাম। সান্ত্বনা পাটনা ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড. করে ওখানকার একটা স্কুলে চাকরি নিলো।

গরমের ছুটিতে আমি তখন বাড়িতে আছি। ছোটকাকা আমাদের কাছে ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে। ছোটকাকা এখন ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট সুব্রত চ্যাটার্জি। উড়ুক্কু বিমানে ঘোরাফেরা করে। সামরিক বিমান চালক। আমাদের পরিবারে কিংবা চেনাজানাদের মধ্যে সামরিক বিভাগে কাজ করে এরকম কেউই ছিল না। ছোটকাকার নতুন কর্মজীবনের কথা জানার জন্যে কৌতূহলের অন্ত ছিল না আমাদের।

এরপর আমার জীবনে একটা তোলপাড় ঘটে গেল। বাবা-মা'র পছন্দ করা পাত্রকে প্রত্যাখ্যান করে আমার শৈশবের বন্ধু অখিলেশ্বর শ্রীবাস্তবকে বিয়ে করে বসলাম। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে। গুটি কয়েক বন্ধু শুধু সঙ্গে ছিল বিবাহ এবং বিবাহোত্তর সাদামাটা ভোজোৎসবে। অবাঙালী অব্রাহ্মণ ছেলেকে বিয়ে করার অপরাধে আমার বাবা-মা আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

বিয়ের পর আমায় নিয়ে অখিলেশ্বর সিঙ্গাপুর চলে গেল, তার নতুন কর্মস্থলে। আট বছর সিঙ্গাপুরে থাকাকালে দু'বারই শুধু দেশে এসেছিলাম। তবে আমার বাবা-মা কিংবা পরিবারের অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। বাবা-মা'র মনোভাবের পরিবর্তন ঘটবে এরকম কোন দুরাশা ছিল না। ছোটকাকার কথা মনে হত। মনে হত ছোটকাকা হয়তো এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ছোটকাকা আমার বাবা-মা'কে খুব শ্রদ্ধা করতো। তাঁদের বিরুদ্ধে গিয়ে আমার পাশে দাঁড়ানো তার পক্ষে সহজ ছিল না। ছোটকাকার নিজের জীবনেও যে ঝড় বইছিল সে খবর তখন জানতে পারিনি। জানতে পারলাম অনেক পরে, যখন সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।

আগেই বলেছি ছোটকাকা আমার বাবা-মা'কে দারুণ শ্রদ্ধা করতো। আমার ঠাকুরমা আমাদের জন্মের অনেক আগেই মারা যান এবং তারপর থেকে ঠাকুর্দা সংসারে অনাসক্ত হয়ে নবদ্বীপের এক আশ্রমে চলে যান। ক্কচিৎ কখনো ছেলেদের কাছে আসতেন, তা-ও শুধু এলাকার বিশেষ কোন পূজা-পার্বণ, ধার্মিক অনুষ্ঠান

উপলক্ষে। আমার বাবা-মা'ই ছোটকাকার অভিভাবক ছিলেন বলতে গেলে।

আমি সিঙ্গাপুরে যাবার দু'এক বছরের মধ্যে ছোটকাকার বিয়ে হয়। পাত্রী আমার কলেজের বন্ধু সান্ত্বনা, যদিও আমি অনেকদিন অবধি একথা জানতাম না। পাটনায় আমার সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় হয়তো সান্ত্বনার সঙ্গে ছোটকাকার কখনো দেখা হয়েছিল। আমার মুখে সান্ত্বনার কথা শুনে শুনে তার সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যা ছোটকাকার মনে পাকাপাকিভাবে ছাপ ফেলেছিল। তাই অভিভাবকেরা - আমার বাবা-মা - বিয়ের কথা তুলতে ছোটকাকা সোজাসুজি বলেছিল সান্ত্বনাকেই বিয়ে করতে চায় সে। আমার বাবা-মা আপত্তি করেননি কারণ পাত্রী ব্রাহ্মণ, বাঙালী, সুশিক্ষিতা, সুশ্রী। সান্ত্বনার মামা এলেন কথাবার্তা বলতে। সব কিছু মিলে গেল, শুধু গোল বাধলো ঠিকুজি নিয়ে। কন্যার বৈধব্য যোগ আছে, অনেকে যাকে "মাঙ্গলিক" বলে। আমার মা বললেন তবে কাজ নেই এখানে বিয়ে দিয়ে। ছোটঠাকুরপোর জন্যে দেশে পাত্রীর অভাব হবে না। কিন্তু ছোটকাকার ধনুর্ভঙ্গ পণ, সান্ত্বনাকেই বিয়ে করবে, অন্য কাউকে নয়। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের এক বছর পূর্ণ হবার দু'দিন আগে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেল ছোটকাকা।

ছোটকাকার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে আমি বাবা-মা'র কাছে ছুটে গেলাম। বাবা-মা আমাকে জড়িয়ে ধরে অনাথ অসহায় দু'টি শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। ছোটকাকার মৃত্যুর আঘাত তাদের সমস্ত সত্তা যেন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। মানুষ দু'টো আর আগের মানুষ নেই। রাগ, অভিমান, কুল-মর্যাদাবোধ, সে সব কোথায় মিলিয়ে গেছে। সে যাত্রায় সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা হয়নি। সান্ত্বনা তখন কানপুরে। চকেরিতে এয়ারফোর্স স্কুলে কাজ করে। আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করিনি। ইচ্ছে করেনি। আমার অবচেতনায় সান্ত্বনাকেই ছোটকাকার অকাল ও অপমত্যুর জন্যে দায়ী করেছিলাম। তাই তার চরম, নিদারুণ দুঃখের দিনে তাকে সমবেদনা জানিয়ে একটা চিঠিও দিইনি।

এর আট বছর পর সান্ত্বনার আমন্ত্রণে তার কাছে গেছিলাম। সান্ত্বনা তখনো কানপুরে থাকে। এই কানপুরে থাকা কালেই সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছিল।

সান্ত্বনা স্টেশন থেকে আমায় চকেরিতে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। পরদিন দুপুর বেলা ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বড় রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে।

পথের দুই পাশে গ্রাম্য পরিবেশ। মাঠ ঘাট পুকুর। চাষের জমি। খানিক দূরে দূরে ছোট বড় নানা ধাঁচের বসতি ---- ।

বিকেল নাগাদ সুরজপুর মেলায় এসে গাড়ি থামলো। অনেকখানি জায়গা জুড়ে মেলা বসেছে। এত বড় গ্রামীণ মেলা আগে কখনো দেখিনি। সে কি ভিড়! ছেলেপুলে নিয়ে কৃষক দম্পতি, অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা, বেনে-দোকানদার, দিন-মজুর, ভিকিরি কেউই বাদ নেই সেখানে। রকমারি সব ক্রিয়াকলাপ চারিদিকে। ফুলুরি, জিলিপি, খৈ-মুড়কি, আচার-মোরব্বা, রেশমী চুড়ি, নানা রকম খেলনা, রেডিমেড জামা কাপড়, ধুতি-শাড়ি-লুঙ্গির দোকান। সর্বত্রই খদ্দের গিজ-গিজ করছে। এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও। চলমান লোকের ভিড়ে গম গম করছে মেলা।

সান্ত্বনা নৈর্ব্যক্তিক নীচু গলায় বলে চললো আট বছর আগের ঠিক এমনি একটা দিনের কাহিনী। সেদিনও মেলার কর্মকাণ্ড চলছে পুরোদমে। হঠাৎ আকাশে অন্য একটা আওয়াজে সচকিত হয়ে সবাই দেখলো মাথার উপর একটা এরোপ্লেন। সাধারণ এরোপ্লেনের তুলনায় মাটি থেকে অনেক কাছে রয়েছে প্লেনটা। দেখতে দেখতে প্লেনটা ডানা কাত করে আরও নীচে নেমে এলো। তারপর মেলার ভিড়ভারাক্কা পার হয়ে এলাকার একপ্রান্তে এসে আগুনের সহস্র লেলিহান শিখায় ফেটে পড়লো।

বায়ুসেনার বিধিবদ্ধ নিয়মমাফিক ছোটকাকার প্লেন দুর্ঘটনার পুরোদস্তুর এনকোয়ারি বসেছিল। তদন্তে প্রকাশ পেলো স্কোয়াড্রন লীডার সুব্রত চ্যাটার্জির প্লেন বেচাল হবার পর তার হাতে যথেষ্ট সময় ছিল যখন সে অনায়াসে "বেল আউট" করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারতো। সেক্ষেত্রে চালক বিহীন প্লেনটা ওই এলাকার যে কোনও অংশে মুখ থুবড়ে পড়ে মেলার আনন্দোৎসবকে শ্মশানে পরিণত করে দিতো। সুব্রত চ্যাটার্জি সেই প্রলয়ঙ্করী সর্বনাশ এড়ানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় প্লেনটাকে মেলার এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, প্যারাসুট খুলে নীচে লাফিয়ে পড়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর কোনই প্রয়াস করেনি। সেই ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে অবিচলিত থেকে অগুন্তি মানুষের কল্যাণে নিজের অনিবার্য মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছে।

****

এখন আর আমি ঠিকুজি-কোষ্ঠীতে বিশ্বাস করি না। কারণ আমি জানি যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শুভাশুভ বিচারের ক্ষমতা নিহিত আছে। মানুষ পর-পরিচালিত যন্ত্র নয়। সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।